জীবনচরিত

জয়া মিত্র

হারাধন ভাবে জল কি সত্যই তাহার পিছন পিছন আসে? কতো জল বা আছে এই দেশে। এই ভোবনে কত জল বানাইয়া থুইছে বিধি। আকাশ হইতে জল, মাটিতেও জল, সেইখানে আবার কতক জল চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, কতক দৌড়াইয়া পিছু লয়। উপর দিয়াই আসে - সে কথা সত্য অবশ্য। কিন্তু তাহার কপালে কিংবা তাহার পায়ের তলার মাটি লেখে নাই ভগবান।

তাহার জন্মের সময়ও বন্যা হইতেছিল, সেকথা সে শুনিয়াছে। মাকে সে কোন দিন দেখে নাই, দেখার প্রশ্নও ছিল না। গঙ্গানদীতে ভয়াবহ বন্যার সময়ে সে জন্মায়। তাহাদের ঘর তাহাদের গ্রামের সমস্ত লোকের ঘর জলের তোড়ে ভাঙিয়া ভাসিয়া যাইতে ছিল। নিজেদের ঘরের খড়ের চালের উপর তাহার মা আর পিসি ঘরের দুইটা চালের কলসি আর কিছু কঁাথাকানি লউয়া বসিয়াছিল। এমনকি তাহারবাবাও ছিল না, বাবা দুইদিন আগে দুইটা ধাড়ি ছাগল লইয়া সদরের হাটে বেচিতে গিয়েছিল, ফেরে নাই। শনিবার খুব সকালে নাকি বাবা গিয়াছিল ওই দুইটাকে বেচিয়া খানিকটা চাল কিনিয়া আনিবে এমন বুদ্ধিতে। তখনও তাহাদের পঞ্চানন্দপুরে বৃষ্টি নামে নাই কিন্তু আকাশ খুব মেঘে ভারী ছিল। বাবা চলিয়া যাওয়ার খানিকপর হইতে জল বাড়িতে থাকে, গ্রামের সব লোকজন ছুটাছুটি করিয়া আরও দূরে আরও একটু উঁচু জায়গার খোঁজে যাইতে চায় আর সেই সময়ে তাহার মায়ের প্রসববেদনা শু হয়। হারাধন এখন ভাবে এতবোকা কেন ছিল সে। যদি তখনই জন্ম লইবার জন্য ব্যস্ত না হইত, হয়ত মা অমন বিপদে পড়িত না। মাও তাহাকে লইয়া, পিসির সঙ্গে কোন রকমে হাইস্কুলের দোতলায় উঠিতে পাইত। শক্ত মাটিতে শুইয়া আরও পাঁচটা মেয়েমানুষের যোগাড় যত্নের মধ্যে সন্তানের জন্ম দিতে পারিত। সে নিজেও যদি স্কুলঘরের দোতলায় অর্থাৎ কিনা ঘরের মেঝেতে জন্মিবার সুযোগ পাইত হয়ত তবে বাকি জীবনটা তাহারও পায়ের নিচে মাটি থাকিত। মাথার উপর উপর্চরণ বৃষ্টি আর মায়ের পিঠের নীচে প্রায় ভাসন্ত চতুর্দিকে জলঘেরা এক খড়ের চাল - এই রকম অবস্থার মধ্যে সে মায়ের শরীরের আশ্রয় ছাড়িয়া মাটিতে, না মাটিতে নয়, মাটির চল্লিশ পঞ্চাশ হাত উপরে, মাটির নজরের বাইরে ভিজা খড়ের উপর জন্মিয়া ছিল - সে কারণেই কি জল তাহাকে 'জলের জীব' বলিয়া ঠাওরাইয়াছে। যেখানে সে যায় কিছুতে তাহার পিছন ছাড়ে না। কেন সে এতো ব্যস্ত হইল জন্মিবার জন্য? তাই জন্যই তো বেচারি তাহার মাকে প্রথম প্রসবকালে নিজে হাতে বাঁশের চাঁচারি দিয়া সন্তানের নাড়ি কাটিতে হইল, ওই বন্যা জলে ভিজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল চারদিন যতক্ষণ না জল কম হয়, ভেলা লইয়া রিলিফবাবুরা আসে, মায়ের ধুম জ্বর শরীরের মাই হইতে তাহাকে, ভিজিয়া ভূত ক্ষুধাতিষ্টায় আধমরা পিসিকে ও অচৈতন্য মাকে চাল হইতে নামাইয়া মহানন্দা বাঁধের উঁচু জায়গায় লয়। তারপর রিলিফ ক্যাম্পের তাঁবুতে তারপর সদর হাসপাতালে। ততদিনে মায়ের শরীর ফুলিয়া ঢোল হইয়াছিল। পচিয়া খুব যন্ত্রণা পাইয়া মরিয়াছিল মা। তাহার সতের বছরের মা। হয়ত মা ওইভাবে মরায় তাহার উপর সদর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু দিদিমণিদের দয়া হইয়াছিল। তাই এক সপ্তাহ বয়সের মা-মরা ছেলে বাঁচিয়া যাইবার মত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাহার বাবা যতদিনে এর ওর মুখে খবর নিয়া শহরের সদর হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছায় ততদিনে মায়ের চিহ্নও ছিল না। তাহার বাবা নাকি বৌয়ের শোকে বুক চাপড়াইয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়াছিল।

পিসির মুখেই এসকল কথা শুনিয়াছে হারাধন, পিসি উদাস ভাবে বলিত -
অমন কত যায় বন্যার কালে। নদী মা তো মা-রাগলে করালী। সাপটির মাথায় পাথর ছেঁচা দিলে সে দংশায়, সাপের যতটুকু প্রাণ ততটুকু ছোবল দেয় আর নদী হইল গিয়া মহাপ্রাণী - গঙ্গা মা সাক্ষাৎ দেবী তারে সুরে নরে প্রণাম করে, তার বুকে পাথর চাপা দিলে স্যায় দংশাইব না।

কিন্তু হারাধনের মা 'পাথর চাপা' দেয় নাই নদীর বুকে, সুতরাং তাহার মরার এই কারণটি হারাধনের পছন্দ হয় নাই। ডাক্তারে নাকি বলিয়াছিল বন্যার সময়ের জল খুবই নোংরা থাকে, কোনভাবে সেই নোংরা জল মায়ের শরীরের ক্ষতস্থানে লাগিয়া মায়ের শরীর বিষ হইয়া যায়। বন্যার জল যে কতো বিষ হয় সে কে না জানে। মরা গ ছাগল ফুলিয়া বিশালকায়। ডোবা বাড়ির চালে লাগিয়া আছে, গায়ে মাথায় বসিয়া কার চক্ষু কি পেট ঠোকরাইয়া খাইতেছে, বীভৎস গন্ধ- হারাধন কি দেখে নাই! বন্যার জলের মাছ খাইয়া কত লোক বমি পায়খানা করিয়া মরে। ওই মাছ খাইতে নাই সকলেই জানে কিন্তু ক্ষুধা বড় বালাই।

বাবা আবার বিবাহ করিল, আবার ঘর গড়িল, উঠানে পুঁই মাচা কুমড়া মাচা বাঁধিল। ক্ষেতের কাজ জুটাইল, ততদিনে হারাধন পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া পাটকাঠির ডগায় আঠা দিয়া ফড়িং ধরিতে শিখিয়াছে। ফড়িংকে মুঠোর মধ্যে ধরিলে কি জোরে পাখা কাঁপায়। গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু বর্ষায় আবার বন্যা আসিল, বন্যার জল নামিবার কালে 'পালাও পালাও' রবে সকলে গ্রাম ছাড়িল আর চোখের সম্মুখে নদীকূলবর্তী গ্রামের অর্ধেক অংশ শিশুর হাতের খেলনার ন্যায় ঝুপ-ঝপাস্ করিয়া জলের মধ্যে নামিয়া গেল। সেই জায়গায় আমগাছ বাঁশঝাড়গুলির মাথা, বনকাবাড়ির থানের মন্দির শীর্ষে গাঁথা ত্রিশূলখানি জাগিয়া রহিল, তার চারিপাশ দিয়া কল্ কল্ শব্দে গঙ্গা বহিতেছিল। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া লোকে চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, গিন্নিরা বৌ ঝিয়েরা আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িতেছিল। হারাধন পিসির কোলে ছিল। জল দেখিয়া, যেখানে তাহাদের বাড়ি উঠান পুঁই মাচা, মাচার তলায় তাহার জড়ো করিয়া রাখা পাট কাঠি, খোলামকুচি ছিল - সেই সবখানটাতেই সহসা গঙ্গানদীকে বহিয়া যাইতে দেখিয়া, সে হতভম্ব হইয়াছিল। লোকেদের কান্নার শব্দ, সেই ঝুপঝপাস্ শব্দ তদবধি কত বছর তাহার সঙ্গী হইল।

পিসি চিরকাল তাহাদের সংসারেই থাকিত। এ কথাও সে পিসির মুখেই শুনিয়াছে যে বিবাহের সময় দরিদ্রের মেয়ে বলিয়া পিসির বাবা বরপক্ষকে টাকা পয়সা প্রায় কিছুই দিতে পারে নাই। কেবল জামাইকে চারকাঠা জমি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু নদীর গ্রাসে প্রথমে যে অঞ্চল চলিয়া যায় সেই মাণিকচকেই ছিল পিসির বাবার সেই জমি সহ অন্য আরো জমি। নদীকে ধারে কন্যার বিবাহ দিতে হয় না, রাজনৈতিক সামরিক ঝঞ্ঝাতে নদীকে দেশত্যাগ করিয়া নতুন মাটিতে শিকড় মেলিবার চেষ্টা করিতে হয় না হারাধনের ঠাকুর্দা ও তাহার গ্রামবাসীদের যেমন হয়, সুতরাং বাঁধ পড়িবার রাগে নদীর ঢেউ ধাক্কা দিয়া নরমমাটির পাড় ভাঙে। সেই মাটিতে যে লোকেরবসত আছে, খেত আছে, সেই মাটিতে সদ্য আগত বাসুতপ্রয়াসশীল মানুষের জামাতার কাছে প্রতিশ্রুত জমি আছে - তাহাতে নদীর কীইবা আসে যায়। পিসির কপালে নিজের ঘরকরা ঘটিয়া উঠে নাই। পিসির বর সাইকেল ও নগদ টাকা লইয়া আবার বিবাহ করে। যদিও পরে ছিয়ানব্বই সালের বন্যায় ও নদীভাঙনে গোপালপুর গ্রামের সঙ্গে সেই পিসেমশায়ের ঘরবাড়ি জমি সাইকেল কলাইয়ের মরাই - সমস্ত কিছুই নদী খাইয়াছিল। কিন্তু পিসি তদবধি নিজের ছোট ভায়ের সংসারেই থাকে, কাঁথায় ফোঁড় দেয়, পলু পোকা সিদ্ধ করে, রেশমের সুতা ছাড়ায় আর হারাধনকে পালন করে। বস্তুতপক্ষে পিসি না থাকিলে হারাধন বাঁচিয়া থাকিত কিনা তাহাও অনিশ্চিত। বাবা তাহার মুখ দেখে নাই এক মাস, কচি বৌয়ের শোকে পাগল হইয়াছিল। পিসি পাড়ার এক অন্য সদ্যপ্রসূতির বুকের দুধ ভিক্ষা করিয়া হারাধনকে বাঁচায়। বাবা যখন তাহাকে দেখিল তাহার নাম দিয়াছিল 'ফেলা'।

কি কথা কইস! এই পোলা ত'গেছিল! সাতদিন মা-মরা পোলা নি বাচে! আমি কুসুমবউয়ের পায়ে ধইরা দুধ খাওয়াইয়া

হ্যারে বাঁচাই, হ্যার নাম হইব হারাধন।

সেই হারাধন, পিসির হারাধন সেই বার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল হারাইয়াছিল। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে মালদার বিখ্যাত সব আমবাগান মেঘছায়ায়, পাতা হইতে গড়াইয়া পড়া জলের ধারায়, আরও অন্ধকার হইয়া যায়, সেই বজ্রবিদীর্ণ অন্ধকার রাত্রিতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া গ্রামের মানুষরা আমবাগানগুলিতে আশ্রয় নেয়। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার জন্য একটুখানি জমি তো মানুষের পায়ের নিচে, পিঠের কাঁধের নিচে থাকিতেই হইবে। বন্যায় গৃহহারা মানুষরা আমবাগানে আশ্রয় লউবে - ইহা এখানে বরাবরের নিয়ম। যে সম্পন্ন আর যে বিপন্ন তাহাদের মধ্যে এই সামাজিক নৈতিক বোঝাপড়া বহুদিন যাবৎ চলিত আছে পূর্বে এই ব্যবস্থাটির মধ্যে জটিলতা কম ছিল - বন্যায় লোকের ঘরবাড়ি ডুবিত, দুর্গত জনেরা আসিয়া আমবাগানে আশ্রয় লইত, জল নামিলে ফিরিয়া গিয়া ঘর সারানোর কাজে মন দিত। খেতে পলিমাটির নরম আস্তরণের উপর কলাই ছিটাইত, কেহ বা তুঁতের বাগানে মন দিত। তেমন গাঁ-ঘর ডুবানো বন্যা আসিত চারবছর পরপর।

কিন্তু সেই বাহাত্তর তিয়াত্তর সন হইতে ধীরে ধীরে নদীর মূর্তি পালটাইতেছে। ওই যে নদীর বুক বাঁধিয়া ব্যারাজ বসিল - সকল লোক তাহাকেই গালি দেয়। বলে, ওইখানে বাধা পাইয়া নদী ক্ষেপিয়াছে তাই মানুষের উপর রাগিয়া গ্রাম খায়। কেহ বলে ব্যারাজে বাধা পাইয়া নদীর জল রাখিবার খাত অকুলান হয় তাই পাশ কাটিয়া নিজের ঘর বড় করে। আসল কথা কে জানে, কিন্তু ভাঙানিয়াদের আশ্রয় দিতে লোকে ভয় পায়, পাছে বসিয়া যায়। তাই বর্ষা শরত শীতও আমবাগান আশ্রয় দেয় কিন্তু সহকার শাখার মধুবর্ণের প্রথম মুকুলটি দেখা দিবা মাত্র বাগান খালি করিয়া দিতে হয়। তখন বড় বিপদ, বড় কষ্ট। তখন সদরে গিয়া হাসপাতাল মোড়ে, বাসস্ট্যান্ডে লোকের কাছে ভিক্ষা করা, রথতলার মোড়ে বসিয়া থাকা, ট্রাকরাস্তার ড্রাইভাররা যদি দয়া করে একটি টি আধখানাও যদি -

আট নয় বৎসরের সতীন কাঁটাকে বসিয়া খাওয়াইবার দায় নেয় নাই হারাধনের বাবার নতুন বউ। পাঁচ বছর সে ভাত দিয়াছে - নিজেকে একবেলার ভাত জুটান দুর্লভ, তাহার নিজের তিনটা কচি, বারবার ভাঙনে সমস্ত জমি যাইতে স্বাধীন ভাবে নির্দিষ্ট উপার্জন নাই। সে নিজে কোনদিন একবেলা পেটভরিয়া খাইতে পায়না - সতীনপুতের উপর অতো দয়াধর্ম করিবার তাহার আর ধৈর্য ছিল না। পিসি খুব ঝগড়া করিয়াছিল, শেষে মিনতিও করিল। কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। পিসি তাহাকে লইয়া একটা ঘর বাঁধিয়া কিছুদিন ছিল। তাহার পলুর কাজ ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদের পরিচিত অঞ্চলে বড় বড় তুঁতগাছের বাগান নদীগর্ভে গিয়াছিল। তাছাড়া কাজ করিবার লোকের সংখ্যা বাড়িতেছিল। সীমান্ত পার করিয়া সর্বহারা লোকজন বাঁচিবার আশায় এদেশে আসিত দেখিত এখানকার লোক পায়ের তলার মাটি হারাইয়া ভিখারী হইয়া ঘুরিতেছে। ক্ষুধা আর নদীর ভয় হারাধনের নিরন্তর সঙ্গী ছিল এসময়।

গ্রামের আরও কিছু ছেলের সহিত এগারো বছরের হারাধনও একদিন বম্বের ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছিল। বম্বে নামক সেই আশ্চর্য রাজ্যে নাকি কেবলই বাজার আর সেই বাজার ভর্তি কাজ। কাজ করিলে পয়সা, পেট ভরিয়া যা খুশি খাও। মধু মিঠুন রাজেশ তরিকুলদের সঙ্গে দাদর নামের সেই বিশাল বাজার, কতো জিনিস চারিদিকে, লোকেরা কেমন করিয়া কথা বলে - আর তাহার গ্রামের এই লোকগুলি কি না এই সকলই জানে।

কিন্তু এই পুলক তাহার স্থায়ী হয় নাই। মধু তরিকুলদের সঙ্গে রাস্তার পাশে ফুটপাথের উপরে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত। তখনও বর্ষাকাল শেষ হয় নাই। টিপটিপ বৃষ্টি, সারা ফুটপাথ কাদায় ভরা তাহারই মধ্যে সারি দিয়া লোক ঘুমাইয়া আছে। তাহারাও চেষ্টা করিয়াছিল পুরানো খবরের কাগজ পাতিয়া ঘুমাইতে। দ্বিতীয়দিনে রাত্রে উপরের কোন জানলা দিয়া কেহ অনেকখানি জল ফেলিলে সোজা হারাধনের গায়ে পড়ে। আচমকা ঘুম ভাঙিয়া ভয়ানক ভয় করে হারাধনের। সারাদিন সে আর মধু ঠেলাগাড়ি ঠেলার কাজ করিয়াছিল। আঠারো টাকা দিয়া দুইজনে দোকানের খাবার খাইয়াছে। খুব ঝাল, খুব মসলার গন্ধ। এখন তাহার পেট ব্যথা করে, পায়খানার বেগ আসে। কিন্তু চতুর্দিকে লোক ঘুম

াইতেছে। তাহার শীর্ণ শরীরের প্রতিটি হাড় ব্যথায় কাতর। সহসা এসকল ছাড়িয়া ব্যাকুল হইয়া বাড়ি যাইতে চায় সে।

কিন্তু বাড়ি আসে নাই। হাওড়া পর্যন্ত আসিয়া যে টেরেনে উঠে সেখানে একজন গানগাওয়া ভিখারির সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে ক্লান্ত হারাধনকে স্লীপার কোচের বাথমের সামনে ঘুমাইবার জায়গা দেয়। বিড়ি দেয়। হারাধন বিড়ি আগে খায় ন াই, টান দিয়া তাহার শুকনা বিষম লাগে, গা বমিবমি করে। রাত্রি দশটার সময়ে কালোকাট পারে বাবু আসিয়া তাহাদের দাঁত খিঁচায়। স্টেশানে নামাইয়া দেয়। আরোও কতগুলি ছেলে, কয়েকটা লোক - হারাধনের মত সেই স্টেশান প্লাটফর্মের কিনারে আধো অন্ধকারে শুইয়া থাকে। ক্ষুধায় তাহার হাত পা অবশ। তাহাকে আনচান দেখিয়া পাশের ছেলেটা অশ্লীল কথা বলে। হারাধন ক্ষুধার কথা জানায়। বম্বে ছাড়িবার সময় তরিকুলের কাকা যে একবছরযাবৎ দাদর বাজারে মুটে গিরি করে, সে কয়টা কলা হাতে দিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়াছিল। গত আড়াইদিনে আর কিছু খাদ্য জোটে নাই।

ভোখ লাগলে লড়াচড়ি করছিস কেনে? কলে জল আছে, যা খায়েঁ লে পেট ভইরে। রাতটুকু ঘুমায়ে লে, সকালে ইখানে রইতে দিবে নাই -
কেন?
ইটো দুর্গাপুর। সাহেবদের জায়গা বটে, হামদেরকে ইস্টিশানকে রইতে দেয় নাই।
কোথা যাবি সকাল হইলে?
হামি? ভোরের লোকলটা ধইরে বর্ধমান যাব।
আমারেও নিয়া যাবি?
সেই শু।

কিশোরটির নাম কিষ্ট। তার দেশের নাম বাঁকুড়া। সে আর তাহার দাদা গ্রাম ছাড়িয়া, নিজেদের সদর শহর ছাড়িয়া অ াসানসোল নামের জায়গায় আসিয়াছিল। তাহাদের গ্রামে খাবার নাই, জল নাই। গ্রামের লোক আসিয়া সদর শহরে ভরিয়াছে, সেখানেও কলকারখানা কিছু নাই, কোথায় কাজ পাইবে? তাই তাহারা দুই ভাইয়ে বড় শহরবাজারে আসে। এক বৎসর তাহারা রাস্তা তৈরির কাজ করিয়াছে। এক ঠিকাদার বাবুর কাজ। এখন সেই বাবু বর্ধমানে নতুন কাজ শু করিবে। তাহারা যে সর্দারের অধীনে কাজ করে সে বলিয়াছে যারা কাজ করিতে চায় - বর্ধমানে যাইতে। দলের অনেকে ট াকাপয়সা হাতে পাইয়া গ্রামে গিয়াছে, কেউ কেউ এধার ওধার ছিটকাইয়াছে, কিষ্ট আর তার দাদার মত আরও জন াকুড়ি এই নতুন কাজটাও করিবে বলিয়া বর্ধমানে যাইতেছে। নতুন কাজের শুতে সর্দার লোক নিবে। হারাধন যদি যায় ত াহাকেও নিতে পারে। কিন্তু খুব পরিশ্রমের কাজ - রোদেপোড়া গরমে সিদ্ধ হওয়া কাজ। হারাধন যা রোগা! সে কি পা রিবে?

সাত বছর ধরিয়া কত যে কাজ হারাধন করিল। এক সর্দার হইতে অন্য সর্দার। এক ঠিকাদার হইতে অন্য ঠিকাদার। রাস্তা তৈরি রাস্তা তৈরি রাস্তা তৈরি। মাঝে মাঝে সে ভাবে এই এত এত রাস্তা তৈরি করে কেন ঠিকাদার বাবু? হ্যাঁ একথা সত্য যে রাস্তা হইলে তাহার ভাল। দিন মজুরি চোদ্দটাকা - ছটাকা সর্দার নিলেও আটটাকা তাহার থাকে। কিন্তু এখন আটট াকায় দুবেলা খাওয়া চলে না। রাত্রে চারপাঁচজন এক হাঁড়িতে চাল ফুটায় কোনদিন আলুসিদ্ধ কোনদিন একহাতা ডাল। সেই আগুনেই টি গড়িয়া রাখা। পরদিন দুপুরে সেই টি। রোজ প্রত্যহ। অথচ দোকানবাজারে কত খাবার। কত রকমের খ াবার। বাজারে খাবারের দোকানের ভিড়ে পথ হাঁটা দায়। কাচের ভিতর কতসত রং, কত বাহারের মিষ্টি। কেনাটার আব ার বাইরে কাঁচে সাজানো নাই কিছু নাই কিন্তু এমন গন্ধআসে যে পেটের নাড়িগুলি পর্যন্ত আকুলিবিকুলি করিয়া ওঠে। সামনে দাঁড়াইয়া থাকিলে হ্যাংলা বলিবে, পাছে মারে কিংবা গালি দেয় তাই চলিয়া আসিতেহয়। এসব জায়গায় কত লোক থাকে, এখানেই তাহাদের ঘরবাড়ি। তাহাদের মা কিংবা বৌ রান্না করে। বেলায় বাজারে আসিয়া সস্তারজিনিস কেনে কিন্তু কত যত্নে রান্না করে। তাহার জন্য পিসি যেমন করিত। তারপর যখন হপ্তা পাইয়া একটি প্যান্ট বা গেঞ্জি

কিনিতে হয়। প্রচন্ড উদারময় অথবা জ্বরে যদি দু দিন উঠিতে না পারে। তখন সেই আটটাকাও বাদ যায়। কতো দেশের কত গাঁয়ের লোক যে দেখিয়াছে হারাধন! সকলেই ঘুরিয়া বেড়ায় কাজ খুঁজিতে। কারো ঘর ডুবিয়াছে কারো গ্রামে জল নাই কারো খেত অন্যে কাড়িয়াছে, তাহাদের কাহারও ঘরে খাবার নাই, তাই তারা কাজ খুঁজিতে আসে। তাহা হইলে কি ঠিকাদার বাবু আর তার সরকার বাবু এজন্যই রাস্তা বানায় যেন যতো রাজ্যের কপালপোড়া হতভাগা লোক কাজ খুঁজিতে শহরে আসিতে পারে? একবার শহরে পৌঁছিলে অন্য অন্য শহরে যাইতে পারে? কত লোকের গাঁ পড়ে রাস্তা তৈরির পথে। তাহারা যখন ঝোলবোঁচকা বাচচাকাচচা কাঁধে মাথায় লইয়া গ্রাম ছাড়ে তখন তাহারা্য তো কোন একটা র াস্তা ধরিয়াই শহরের দিকে যায়! গ্রামে কেউ ভিক্ষা দেয় না, শহরে বাচচারা, বুড়ারা ভিক্ষা করে, বয়সের বৌঝিরা কেহ ট্র াক ড্রাইভারদের ধাবায় আশেপাশে গিয়া দাঁড়ায়। হারাধনের সঙ্গীসাথীরাও মাঝে মাঝে সেইসব গল্প করে, সাধ করে। কিন্তু ওইসব মেয়েরা আগে পয়সা চায়। খোরাকির পয়সা দু একজন এক দুইবার হপ্তা পাইয়া সেখানে খরচ করিয়াছে কিন্তু তার বেশি নয়। না খাইয়া কি আর ফুর্তি হয়। ইহাদের বড় মূর্খ মনে হয় হারাধনের। সে যদি কোনদিন সাহস করিয়া বেশি পয়সা খরচ করে তো বাজারে গিয়া নানারকম খাইবে।

বর্ষায় রাস্তার কাজ হয় না। বৃষ্টির জল পড়িলেই কাজ বন্ধ। তখন দুর্দশার সীমা থাকে না। দুই একবার বর্ষায় বর্ধমানে একবার বীরভূমে গ্রামে খেতের কাজ করিতে গিয়েছিল। যাহারা খেতের কাজ করিতে আসে তাহারা লাঠি লইয়া তাড়া করিয়াছিল। উহারা সাঁওতাল। মেয়েপযে কাজ করে। সন্ধ্যাবেলা মাদল বাজাইয়া গান গায়। শুনিয়াছে ইহারা গ্রীষ্মের শেষে নিজেদের বাচচাদের, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের গ্রামে রাখিয়া দল বাঁধিয়া ‘পূবে’ আসে। ইহাদের গ্রাম অনেক দূর। ইহাদের মেয়েগুলি খুব হাসে কিন্তু কোন কথাই বুঝা যায় না। যদি চাষের কাজে জন খাটিতে এতদূরে আসে তবে পৌষে ফসলকাট ার কাজ ফুরাইলে ফিরিয়া গিয়া কি খায়? ইহাদের তো বর্ষা শরতেই কাজ। বাকিটা?

খাটিতে খাটিতে অনেক জায়গা দেখিল হারাধন - অনেক রাস্তার পাথর ভাঙিল, মেয়েরা ধুলা ঝাঁট দিয়া দিলে গলন্ত গরম পীচ ঢালিল, নতুন করিয়া মাটি কাটিয়া চৌরস করিল। দু বছর তিন বছর পাঁচ শত কি চার হাজার বছর করিয়াই চলিল। বানালি দুর্গাপুর এক্‌স্‌প্রেসওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাইপাস, জিটি রোড, কুতুব মিনার, স্ফিংস, অশোক স্তম্ভ, ব্যাবিলে ানের রাণীর মনখারাপের সান্ত্বনার শূন্যোদ্দান। অনেক কাজ শিখিল, তারপর একদিন হঠাৎ নিজের একটি ঘর বানাইবার জন্য তার মন ব্যাকুল হইল।

আটানববই সালের বর্ষাকালে আবার যখন কোন কাজ নাই, খাবার নাই, বাসস্থান নাই - হারাধন বাস ধরিয়া, ট্রেন ধরিয়া রেলবাবুর পায়ে ধরিয়া তাহার নিজের দেশে, নিজের সেই পুরাতন জায়গায় আসিয়া নামিল। সদর শহর হইতে তেইশ-চবিবশ কিলোমিটার দূরে তাহার নিজের গ্রাম। চতুর্দিকে জলে জলময়। তখন বেলা দুপুর। বাস রাস্তা হইতে ম াইল খানেক হাঁটিয়া পঞ্চানন্দপুর পৌঁছাইবার পর দেখে সে আর কিছু চিনিতে পারে না। আট বৎসর আগে ছাড়িয়া য াওয়া গ্রামের চেহারা এত অন্যরকম? ধীরে ধীরে এক দুই করিয়া চেনা মুখগুলি ঠাহর হয়। পিসি কোথায় শুধাইলে সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চায়। সরিয়া পড়ে, উত্তর দেয় না। শেষে মতি পালের মুদির দোকান চিনিয়া সেখানে হ ারাধন কাটিয়া পড়ে।

হইছে কি তোমাগোর? এউগ্‌গা লোক ঘরে আইছে আট বচ্ছর পর, তার একখানা কথার উত্তর করনা ক্যান? কি হইছে আমার পিসির? মরেছে? কবে মরেছে? মতি মুদি তখন আস্তে সুস্তে বলে, বেস্ত হহও না মরে নাই তোমার পিসি। জিন্দা অ াছে, ভালই আছে। বিয়া বইছিল হেই জন। দোজবরে, সংসার করতে আছে ওই পারের চরে দিয়ারায়। এই দিকে আর আসে না।

খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকে হারাধন। কিন্তু স্তম্ভিত হইবার বা অবসর কোথায়? চতুর্দিকে লোক ব্যস্তসমস্ত। এধার ওধ

ার যাওয়া আসা লক্ষ্য করে সে। কি ব্যাপার? কই যাও? তাহার জিজ্ঞাসার উত্তরে কথা ও নির্দেশ মত সে একদিকে অগ্রসর হয়। কিঞ্চিৎ আগাইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। কি আশ্চর্য। এইখানে কে নদী? তাহার আন্দাজমত নদীর দূরত্ব আরও আধামাইলের উপর হইবার কথা। ঘোলাজলের ঢেউগুলিকে তাহার যেন লক্ষ লক্ষ ভয়ংকর জিহাবার মত বোধ হয়। হ ারাধনের চোখে চোখ ফেলিয়া কপিশবর্ণা নদী তাকে টানে। হারাধন স্পষ্ট বোঝে ইহার হাত হইতে তাহার নিস্তার নাই। এত বছরে নদী তাহাকে দূরে থাকিতে দেয় নাই - বর্ধমানের কালনায় গিয়াছিল, এই নদী ফাঁপিয়া মাঠ পাথর ভাসাইয়া ক াজ বন্ধ করাইল। গঙ্গা ছাড়িয়া ময়ূরাক্ষী অজয়ের তীরবর্তী বীরভূমে গিয়েছিল, দুই বৎসর আগেরকার বর্ষায় বক্রের ন ামের এতটুকু এক ছোট নদী আশপাশের সমগ্র অঞ্চল ডুবাইল। তাহার মুখে বাঁধ দিয়া নাকি কী কারখানা তৈয়ারি হইতেছে। হারাধন এও বোঝেনা যে দেশে জেন দু পা ফেলিলে একটি করিয়া নদী সে দেশে সকল নদীর জলের পথেই এক একটি করিয়া বাঁধা কেন? নদীর বুকে পাষাণ যে দেয়, সে দেয়। নদী ক্ষেপিয়া অন্য মানুষের ঘর-গৃহস্থির সর্বনাশ করে।

এই যে এখন সে ফিরিল, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় জেরবার হইয়া, ত্রিভুবনের মধ্যে কেবল এইখানেই তাহার কয়েকটি আত্মীয়স্বজন আছে জানিয়া, এখনও নদী এমন খড়গহস্তে প্রলয়ঙ্করী করালবদনা, জিহাব মেলিয়া দাঁড়াইল কেন? এখানে কোথায় সে নিজের গৃহ খুঁজিবে?

আশপাশে অনেকগুলি জিপগাড়ি ও একটি ট্রাক তাহার নজরে পড়ে। সেইগুলি ঘিরিয়া গুড়ের উপর মাছির মত মানুষের ঘন ঝাঁক। তাহারই মধ্যে পুলিসের উর্দি ও বন্দুকের ডগা দেখা যায়। এক একবার এই ঝাঁক সরিয়া আসে আবার ঘনতর হয়। হাতে হাতে কাঁধে কাঁধে চিড়ার বস্তা সরকারী কর্মীদের সামনে আসে, বন্টন শু হয়। মারামারির উপত্রম দেখিয়া হার াধন সরিয়া যায়। বিকাল হইতে চলিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার নাড়িগুলি চিবায়, জিভ টানিতে থাকে। আশেপাশে কোথ াও জল নাই। ভিড়ের একপাশে বুড়া প্রবল বেগে কাশিয়া উঠে। কাশিতে কাশিতে সে মাটিতে পড়িয়া যায়। হাড়সার পঁ াজরা কাঁপিতে থাকে, চোখ ঠেলিয়া আসে, হাঁ মুখের মধ্যে হইতে চিড়া ছড়াইয়া পড়ে। ক্ষুধার তাড়ায় শুকনা চিড়ায় বিষম খাইয়াছে। কেহ তাহার দিকে লক্ষ্য করে না। হারাধন এদিক ওদিক দেখে একটা চিপাকল চোখে পড়ে, যেটার মুখে খড় ঠাসা, মানে ইহাও জলে ডুবিয়াছিল। জলে ভাসা খড়পাতা ভিতরে ঢুকিয়াছে। এখন ওই কল আর কাজ করিবে না।

হারাধন বুঝিবার চেষ্টা করে সে কি করিবে। ফিরিয়া যাইবে? কোথায় যাইবে ফিরিয়া? এখানেই বা কে আছে তাহার? এই জায়গাটাকেও সে, ঠিকমত চিনে না।

যেখানে শেষবার বাবা সৎমা সৎভাইবোনদের ছাড়িয়া গিয়াছিল, সেই বাড়িও নাই। সেইখানে এখন জল।

হারাধনের শরীর-মন সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়। ভিড় হইতে, চিড়ার ট্রাক আর পুলিসের বন্দুক হইতে সে ধীরে ধীরে সরিয়া অ াসে। একদিকে মাটির দেওয়াল ধসিয়া পড়া একটা দোকানঘরের মাথায় টিনের চালটুকু তখনও লাগিয়া আছে। সেইখ ানে একটি কোণে পিঠ দিয়া হারাধন নিপায় বসে, তারপর ক্ষুধাতৃষ্ণা কোলে কখন তাহার শরীরেঘুম আসে।

ঘুম ভাঙিয়া সমস্তটা বুঝিতে একটু সময় লাগে। তারপর পায়ে পায়ে ফিরিয়া আসে যেখানে লোকজন ছিল।

হারাধন না? কে তাহাকে সামনাসামনি ডাকে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় হারাধন সামনে দাঁড়ানো ফরসা জামাপ্যানট পরা লোকটিকে ঠাহর করিতে চায়। খানিকটা চেনা আদল আসে।
পলু?

পলু হাসে। হারাধনের মাথা অনেকটা ফাঁকা এখন। তবু পলুকে তাহার মনে পড়ে। রেশমপোকায় চাষ ছিল ইহাদের। ছে

াটমতই তুঁতবাগান ছিল। সেই পলু এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যেন চারিপাশের তান্ডবে তাহার কিছু হারায় নাই। সে জিজ্ঞাসা করে,

তুই যে ঘর ছাইড়া গেলি, কি করিস এখন? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলে, এইখানে কবে আইলি।

একটা চেনা লোক দেখিয়া, সেই লোকটিকে তাহার খোঁজ লইতে দেখিয়া হারাধন যেন একটা খড়ের কুটাও পায় হাতে। তাহার সাধ্যমত গোছাইয়া পলুকে সে নিজের অসহায় দূরবস্থার কথা বলে। বলে যে কিভাবে বাবাকে পিসিকে একবার দেখিতে আসিয়াছিল সে, কিআশা ছিল যদি এই অঞ্চলে তাহাকে দুই মুঠা ভাত দেয় তবে সে আর দূরে বিভূঁয়ে পথে লে াটাইয়া ফিরিবেনা। পলু শোনে। বলে,

তোর পিসি তো বিয়া বইছিল একটা দোজবরের সঙ্গে। চইলা গেছে এইপারে দিয়ারায়। তর ভাইগুলা শয়তান হইছে, হর সময় ফাল দিয়া বেড়ায়।

আবার একটু কিছু হিসাব করে সে মনে মনে। তারপর বলে, ভালো ভালো, এইখানে দাঁড়ায়া কি কথা হয়? তুই আয়।

বড় মানুষদের মত, শহরের লোকেদের মত তাহার হাবভাব, সে হারাধনকে লইয়া অগ্রসর হয়। মতিমুদির দোকাঘরের পিছন দিকের দরজাটা খোলা। ট্রাক হইতে বস্তা নামাইয়া সেইখানে স্তুপ হইতেছে। দরজার কাছে একটা চেয়ার টেবিল প াতা। মতি নামানো বস্তা গুলিতে ছিল, পলুর সঙ্গে হারাধনকে দেখিয়া চোখ টিপিয়া অদ্ভুত হাসিল।

এখন আর আশেপাশে লোকজন বিশেষ নাই, অন্ধকারে কোথাও না কোথাও আত্মজনদের সঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। পাকা রাস্তায় কিংবা আমবাগানে। কেবল এই ঘর ও আশপাশে কয়টি লোক আর এই পেট্রোম্যাক্স-এর আলো জাগন্ত।

পলু চেয়ারটায় বসে। হারাধন ভাবে পলুর কাছে ক্ষুধা জানাইবে কিনা। কিন্তু ক্ষমতা দিছে, ভোট দিছে। আমি সকলের উপকার করি কিন্তু মাইনসের মনে হিংসা ভরা। কেও ভালো দ্যাখতে পারে না। তুই কি এহানে থাকবি?

কোথায় থাকুম?

হেইডা তর্ চিন্তা নাই। তুই এইখানের মানুষ বন্যায় ঘরবাড়ি ভাসছে। খাওনের সংস্থান নাই - তগো মতন দুঃখী লোকের জন্য সরকারের বেবস্থা আছে। আমি তর বেবস্থা কম, তুই থাক। আমার সঙ্গে আমার কাছে কাছে থাকবি, নিমকহারাম গে া লগে মিলমিশ করবি না। আমারএকখানা বিশ্বাসী জোয়ান সঙ্গী দরকার। তুই আমার গেরামের ছুটকালের বন্ধু - এতদিন বাইরে রইয়া সংসারটাকে চিনছস। তুই থাক।

কোথায় থাকুম? হারাধন আবার শুধায়।

কুন চিন্তা নাই। তরে আমি রিলিফ পাওয়াইয়া দিমু - দেখি তর সৎভাইগো কতবড় মুরোদ। দল পাকায়! বাড়ি তর, তর নামে বাড়ি সারানোর রিলিফ লিখ্যা দিমু, তর মালিকানা হইবে।

কোনো বাড়ির ছবি ভাসেনা হারাধনের চোখে। এত জল চতুর্দিকে কিন্তু কি জানি বানভাসিদের বাড়ি বানাইবার জন্য যদি টাকা দেয় পলু সে তবে নদী হইতে অনেক দূরে গিয়া ছোট ঝুপড়ি বানাইবে। কিন্তু এখন?

বড় ক্ষুধা আর তিষ্টা লাগছে।

পলু বলে তাইত! এইখানে তো খাইবার কিছু নাই - তুই এক কাজ কর হেই ট্রাকে উইঠা সকালে সদরে যা, খাওয়া দাওয়া কইরা ঘুইরা আসিস।

পকেটে হাত দিয়া একটা দশ টাকার নোট বাহির করে সে। তারপর সেটা রাখিয়া অন্য একটা নোট হাতে নেয়, পঞ্চাশ টাকা।

এইখান নে। প্যাট ভইরা ইচ্ছামত খাবি। এক্কেরে ভাত খায়া বিকালে আসিস।

দুইটা একসঙ্গে করিতে পারে না হারাধন। প্রথমটাই করে সে।

সকালে ট্রাকে চাপিয়া শহরে আসে। হাসপাতালের মোড়ের দোকানে লাল টকটকে জিলাপি খায়, হলুদ রঙের গজা খায়। তারপর ভাত ডাল বড় বড় খন্ড করিয়া কাটা সুমড়ার ব্যঞ্জন মাছের ঝোল তেঁতুলের টক আরো একটু ভাত, ডালের পয়সা লাগে না, তেঁতুলেরও না। খুব খায়। সাধ মিটাইয়া।

গাছতলায় গিয়া শোয়। অসহ্য যন্ত্রণা শু হয় পেটে। বমি আসে। কত কষ্টের কত সাধের ভাত, কুমড়া, সুনদর রহস্যময় পাক দেওয়া জিলাপি - গলা দিয়া উঠিয়া আসে। হারাধন চপিয়া রাখিতে চায়, থাকে না। তারপর দাস্ত।

বিকাল শেষ হইবার কালে, হাসপাতালের সামনের রাস্তায় শিরীষ গাছের ঝিরঝির পাতার নীচে হারাধন নামে একুশ বছরের নবীন যুবা মরিয়া পড়িয়া থাকে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com